Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.113-117
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলার লোকসঙ্গীত

সুপর্ণা পতি
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার-, সঙ্গীত বিভাগ, ভট্টের কলেজ, দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract :

The spontaneous music of happiness, sorrow, joy and separation that has emanated from the simple and unpretentious people who grew up in the bountiful greenery of nature is known to us as Folk music. Depending on country, time and place this music captures us in its various forms. Another name for folk music is Regional music. The range of this music is widely observed in various customs and rituals including Puja-Parvana. Folk music is a distinct class of music. These songs reflect minutely the happiness, sorrows, hope and aspirations, activities and lifestyles of the rustic people. Pangs and anxieties, hopes and longings of unpolished, uneducated or poorly educated simple rustic people, are manifested in this music. A brief review of some genres of Bengal as well as Indian folk music based on country, place, time and language is made here.

লোকসঙ্গীত বলতে শহর ও গ্রামের অর্ধশিক্ষিত বা নিরক্ষর অসংস্কৃত জনসাধারণ থেকে কোল, কান্ধা প্রভৃতি আদিবাসী মানুষদের মুখে মুখে রচিত গানই হল লোকসঙ্গীত। গ্রামের মানুষের কর্মব্যস্ত জীবন, মাঠে লাঙল চালানো, ঘরে শস্য তোলা, গাছে জল সেঁচা, গাড়ি চালানো, নৌকা বাওয়া। এই ব্যস্ততার মধ্যে গান গায় ,কাজ করে। গান করে উৎসবে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও। দীর্ঘ পথের ক্লান্তি ও কঠিন শ্রমের বিরক্তি মুছে দেয় তার গান।এই ভাবে লোকসঙ্গীত প্রথমত জন্ম হয় মুখে মুখে। জন্মদাতারা ছিলেন অধিকাংশ নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত। এদের রচনার পেছনে কোনও যশ বা লিপ্সা ছিল না - ছিল প্রাণের খেয়ালী আবেগ, বর্তমান কালেও যার দাবী অনস্বীকার্য। লোকগীতির রচয়িতাদের নামের মতো এই গীতের জন্ম-তারিখের ইতিহাস নেই। শুধু কোন্ যুগের তার কিছু অনুমান করা যায় মাত্র। লোকগীতির প্রকাশ বহুমুখী। অঞ্চল ভেদে বাংলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লোকসংগীত হল:

বাউল: বাউল একটি সম্প্রদায়। মানব ধর্মই এই সম্প্রদায়ের মূল কথা। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে বাউল লোকসঙ্গীতের জন্মকাল বলে অনুমান করা হয়। সহজ-সরল ভাষার একতারা বাজিয়ে বৈরাগীরা বাউল গান করেন। বাউল গানের গীতভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র দরদ ও বেদনায় বাউল মনের মানুষকে খুঁজে বেড়ায়। এই গীতরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গানের সঙ্গে বিশেষ ধরনের নৃত্য, যা অন্য কোনো গীতরীতিতে নেই। সর্বোপরি ডান হাতে একতারা এবং বাম হাতে ডুগী সহযোগে নৃত্যের মাধ্যমে বাউল গান স্বতন্ত্র্যের দাবী রাখে। পশ্চিম বাংলার এক শ্রেণীর সাধক সম্প্রদায় যাঁদের 'বাউল' বলা হয়, তাঁরা এই গান গেয়ে বেড়ান। এঁদের মধ্যে দীন বাউল, রামচাঁদ, নবীন দাস, মদন বাউল এবং বর্তমানে পূর্নদাস বাউল-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কীর্ত্তন: বাংলার আদিগান হল কীর্তন গান। বাঙ্গালীর জীবন ধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত এই গান। এই গানের সময়কাল সঠিক ভাবে জানা না গেলেও এর প্রথম সোপান হিসেবে জয়দেবের গীতগোবিন্দের গীতরীতিকেই গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়তঃ জয়েদেবের অনুগামী বিদ্যাপতির মৈথিলী সঙ্গীত ধারা। তৃতীয়তঃ চণ্ডীদাসের গানে একদিকে যেমন জয়দেবের ধারার প্রভাব দেখা যায় অন্যদিকে তেমনি বিদ্যাপতির মৈথিলী ধারার প্রভাবও বর্তমান। চতুর্থতঃ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মলগ্নে নবদ্বীপ

হরিনাম গানে মুখরিত হলে শ্রীচৈতন্যদেবকেই নাম সংকীর্তনের প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। তাঁর সময় কীর্তনীয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কীর্তনের বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ভাষার ভিত্তিতে খোল, মন্দিরা ও করতাল সহযোগে এই শৈলীর গান হয়ে থাকে। প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ এই গান বাঙ্গালীর বিশেষ গর্বের ও সংস্কৃতির পরিচায়ক।

ভাটিয়ালী: নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশের মাঝিমাল্লাদের দ্বারা উদ্ভূত এই সঙ্গীত সর্বজনগ্রাহ্য এবং প্রিয়। আত্মীয় প্রিয়জন থেকে বহুদূরে থেকে মাঝি মল্লারা ভাটার টানে নৌকা বাইতে বাইতে আপন মনে সুখ দুঃখের কথা মেঠো সুর দিয়ে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এই গানকেই ভাটিয়ালী গান বলা হয়। অঞ্চল ভিত্তিতে এই গানের ভাষা তথা সুরের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

ভাদু ও টুসু গান: বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান অঞ্চলের বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত হল ভাদু। এই গান কুমারী মেয়েদের সমবেত সঙ্গীত। কথিত আছে মানভূম অঞ্চলের পঞ্চকোটের মহারাজা নীলমণি শিং দেও বাহাদুরের আদরের সুন্দরী মেয়ে ভদ্রেশ্বরীর বিয়ের আগেই পানিপ্রার্থী বরের অকাল মৃত্যুতে স্বেচ্ছায় বাগদত্ত পতির জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন কে উদ্দেশ্য করেই ভাদুপুজা ও তার গান প্রচলিত হয়। ভাদুদেবীকে ঘিরেই সারা ভাদ্র মাস এই উৎসব চলতে থাকে। প্রধানত কুমারীরা গ্রামে গ্রামে ভাদু প্রতিমা তৈরী করে গান গেয়ে গেয়ে পূজা করে। এই গানে রামায়ণ ও রাধাকৃষ্ণের কাহিনী ছাড়াও পাঁচালী গানের রূপ ধরে নানা সমসাময়িক বিষয়বস্তুও রূপ পেতে থাকে। বিহারের লৌকিক গানের সুর ও ছন্দের ঈষৎ প্রভাব এই গানে লক্ষ্য করা যায়।

টুসু হল রাঢ় অঞ্চলের লৌকিক শস্যোৎসব। শস্যের দেবী হলেন টুসু। এই গান সাধারণতঃ রাঢ় অঞ্চলের বাংলা-বিহার সীমান্তে বেশী শোনা যায়। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মানভূম, সিংভূম, বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ১লা পৌষ নবান্ন উৎসবকে উপলক্ষ্য করে টুসু দেবীর পূজা ও টুসু গান হয়ে থাকে। টুসুদেবীকে লক্ষী দেবীর প্রতিভূ হিসেবে গণ্য করা হয়। পৌষ মাসে প্রতি সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে সর্ষেফুল ও গাঁদাফুল দিয়ে নিষ্ঠা সহযোগে নানা উপাচারে এই পূজা হয়। কথিত আছে যে, বিশেষ গুণে গুনান্বিতা রূপবতী টুসু দেবী কোন এক হিন্দু জমিদার তনয়া ছিলেন এবং তাঁর ফুল ও ফলের বাগানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। একবার গৌড়ের বাদশাহের একমাত্র পুত্রের কঠিন পীড়া হয়। সমস্ত চিকিৎসা নিস্ফল হওয়ার পর কোনো এক সাধক, মৃত্যু পথযাত্রী বাদশাহের পুত্রের আরোগ্য লাভের জন্য এক অবিশ্বাস্য ফল ও ফুলের কথা বলেন, যার দ্বারা বাদশাহের পুত্রের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। বলা বাহুল্য, সেই অসম্ভাব্য ফল ও ফুল টুসু দেবীর বাগান থেকে সংগ্রহ করে বাদশাহের পুত্র পুনর্জীবন লাভ করেন। তখন বাদশাহ রূপবতী কন্যার সাথে নিজের পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু, জাতি কুল রক্ষার্থে টুসু দেবীর পিতা বাদশাহের ভয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। সেখানেও মুক্তির উপায় না দেখে নিজের ধর্ম ও সতীত্ব রক্ষার্থে সতী টুসু দেবী নদীর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে নিজের সম্মান রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে এই উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে অবিবাহিত মেয়েরা টুসু দেবীর আদর্শ এবং চারিত্রিক দৃঢ়তাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে তাঁকে লক্ষ্মী জ্ঞানে ১লা পৌষ নবান্ন উৎসব উপলক্ষ্যে পূজা করে থাকে। যেহেতু তিনি লক্ষ্মীগুণ সম্পন্না এবং লক্ষ্মীশ্রী যুক্তা তাই আজও টুসু দেবী মহিলাদের নিকট লক্ষ্মী রূপে গণ্যা।

ঝুমুর গান: একপ্রকার নৃত্যবহুল আদিরসাত্মক লোকসঙ্গীত হল ঝুমুর। ১৪-শ শতাব্দী থেকে এই গান বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, মাণভূম, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলের সাঁওতাল, কোল-ভীল , মুন্ডা প্রভৃতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের গোষ্ঠী সঙ্গীত হল ঝুমুর গান। সাঁওতালী ছেলে মেয়েরা বনফুলে সেজে মাদলের সঙ্গে দল বেঁধে নাচের তালে তালে এই গান গেয়ে থাকে। শাল-পিয়াল মহুয়া বনের মিষ্টি সুরে মাদলের তালে আদিবাসীদের প্রচলিত সঙ্গীত হল ঝুমুর গান। ঝুমুর গানের দুটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়, এক হল লৌকিক ছটা ঝুমুর যা আদিবাসী তথা মুন্ডা ভাষী সাঁওতালদের কণ্ঠে অভিব্যক্ত সহজ সাবলীল প্রেম সঙ্গীত। আধা বাংলা আধা লৌকিক ভাষায় ঘরকন্নার কথা, মেয়ের অলঙ্কার, ফুল, পাখী এবং নতুন জীবন যৌবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় হল এই গানের উপজীব্য। মাদল একান্ত ভাবেই এই গানে সহযোগী আনদ্ধ বাদ্য। দল বেঁধে মাদলের তালে, নাচের ছন্দে এই গান পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয়ত, মল্ল রাজাদের বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বনের পর থেকে কীর্তনের পালা লৌকিক ঝুমুরে রূপান্তরিত হয়। যা পদাবলী কীর্তনের বাধা বন্ধন হারা লৌকিক রূপান্তর এই ঝুমুর গান।

সারি ও জারিগান: নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের একটি জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত সারি গান। এই গান হল দ্রুত তালের কর্ম সঙ্গীত। নৌকা নিয়ে 'বাচ্' খেলার সময় দাঁড়ের টানের সঙ্গে তাল রেখে সমবেত ভাবে দ্রুত তালে যে গান গাওয়া হয় তাকে সারি গান বলে। শুধু নৌকা দৌড়ের সময় নয়, ছাদ পেটানো, ধানকাটা ও ঝাড়াই -এর সময়ও সারি গান গাওয়া হয়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের অতি প্রিয় গান হল জারি গান। জারি গান মুসলিমদের ধর্মীয় সঙ্গীত। মহরম উৎসবে এই গান গাওয়া হয়। কারবালায় ইমাম হাসান ও হুসেনের মৃত্যুর ঘটনাকে অবলম্বন করেই মুসলমান সম্প্রদায়ের অতি প্রিয় এই গান রচিত হয়। সারি গানের মত এটিও সমবেত সঙ্গীত। জারি গান বর্ণনামূলক গান। এই গানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা মালকোচা করে কাপড় পরে এবং তাঁদের প্রত্যেকের হাতে থাকে একটি করে রুমাল, পায়ে নূপুর। নৃত্যের ভঙ্গীতে এই গান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। এই গান হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই শুনে থাকেন। অতি করুন রসের এই গান সকল শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। জারি গানে ঢোলক সঙ্গত করা হয়। এই গান ময়মনসিংহ ও ঢাকা উত্তরাঞ্চলের লোকসঙ্গীত।

ভাওয়াইয়া: ভাওয়াইয়া গান উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে বহুল প্রচলিত লোকসঙ্গীত। এই গানে সাধারণতঃ প্রণয়-প্রণয়ীর বিরহ-ব্যথা মিশ্রিত করুন রসের সুরটিই বিশেষ করে ফুটে ওঠে। এই সুরের মধুর ব্যঞ্জনা অন্তর্নিহিত ভাবকে যথাযোগ্য রূপে নিতে সক্ষম বলেই এই গানকে ভাওয়াইয়া গান বলা হয়েছে। ভাওয়াইয়া গানে অনেকটা ভাটিয়ালী সুরের ছাপ থাকলেও ছন্দ এবং গায়ন ভঙ্গীতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ভাটিয়ালী অনেকটা পুরুষ প্রধান গান, ভাওয়াইয়া সেদিক থেকে নারী প্রধান গান। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই গান গেয়ে থাকেন। দোতারা যন্ত্রটি এই গানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

চট্ কা: চটকা গানকে ভাওয়াইয়া গানের একটি উপশাখা বলা হয়। হাল্কা রসাত্মক, চটুল প্রকৃতির এবং সাধারণত সাংসারিক জীবনে খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু নিয়ে রঙ্গরসই হল এর উপজীব্য বিষয়। সহজ সুর ও হাল্কা রসের চটকদার গান বলে এর নাম চটকা। ভাটিয়ালী গানের সাথে যেমন সারি গানের মিল রয়েছে, তেমনি ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে চটকা গানের তুলনা করা যায়। এই গান প্রধানত উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত।

গম্ভীরা: গম্ভীরা গান হল উত্তরবঙ্গের বর্ষশেষের গান। এই গানের প্রচলন উত্তরবঙ্গে থাকলেও এর প্রচার বেশি দেখা যায় মালদহ জেলায়। গম্ভীরা গানের বৈশিষ্ট্য বাংলার অন্যান্য লোকসঙ্গীত অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিশেষ করে পৌষ সংক্রান্তি, গাজন প্রভৃতি ধর্মীও উৎসবেই এই গান বেশি হয়ে থাকে। সং, শোভাযাত্রা ও নাচের মাধ্যমে মালদহে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যদিও গম্ভীরা গান শিবের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়, তবুও এ গান শিবের স্তুতিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজ ব্যবস্থার সুফল-কুফল,জাতির দুঃখ, লাঞ্ছনা, তার উন্নতি-অবনতি প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়েও গাওয়া হয়। এই গান যেমন মানুষের মধ্যে ধর্মীও ভাব জাগায়, তেমনি এই গান সমাজ সংস্কার মূলক কাজকর্মেও মানুষকে লিপ্ত করে।

লেটো ও পটুয়ার গান: পল্লী সংস্কৃতির একটি অঙ্গ হল লেটো গান। অনেকটা তর্জা গানের মত দু-দলে ভাগ হয়ে প্রশ্নোত্তর, রসিকতা ইত্যাদির মাধ্যমে এই গান পরিবেশিত হয়। এই গানে উপস্থিত বুদ্ধি ও তাৎক্ষণিক রচনা কৌশলের বিশেষ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে লেটো ব্যবহৃত হত। কাজী নজরুল ছেলেবেলায় এই গানের দলে যোগ দিয়েছিলেন।

পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, মেদিনীপুরের তমলুক প্রভৃতি স্থানে পটুয়ার গানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণীর লোক পট অঙ্কন করে নানা ভঙ্গীতে হাতে চিত্র দেখিয়ে এই গান করেন। রাধাকৃষ্ণলীলা, রামলীলা, সত্যপীরের চিত্র ও গান এই গানের মূল বিষয়বস্তু।

যাত্রাগান: যাত্রা ভারতের বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন গান। যাত্রাগান সাধারণত রাম-সীতা, রাধাকৃষ্ণ ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় পালাগান হিসেবে সৃষ্টি হলেও বর্তমানে এই গানের বিশেষ পটপরিবর্তন ঘটেছে। নানা সামাজিক উপাখ্যান ও দৈনন্দিন জীবনের বহু দূরহ সামাজিক সমালোচনামূলক বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে এই পালাগান গ্রামগঞ্জে পরিবেশিত হয়। যাত্রাগান নবকলেবরে প্রকাশ হওয়ার দরুন জন সমাজে আজ বিশেষ আদৃত।

কবিগান: ১৮-শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিগান কলকাতায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই গানের কাব্য, লিখিত ভাবে ধরে রাখা যায়নি। কারণ সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে চাপান উতোরের মাধ্যমে এই গানের লড়াই চলে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং তাৎক্ষণিক গান ও সুর রচনার ক্ষমতা, এই গানে বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণত ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন তত্ত্ব নিয়ে এই গান শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা ব্যক্তিগত গালাগালিতে পর্যবসিত হত। কবিগানের গায়ক বা কবিয়ালগণ ঢোল ও কাঁশি সহযোগে উচ্চস্বরে এই গান গাইতেন। কবিয়ালদের সূক্ষ্ম রসনা, ভাষার চটকদারিতা এবং শাস্ত্রজ্ঞ হতে হয়। কবিয়ালের মধ্যে একজন অন্যতম কবিয়াল ছিলেন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী। যিনি তাঁর অনন্ত কাব্যচর্চা সাধনার মধ্য দিয়ে অশ্লীলতা বর্জন করেন কবিগানে।

বোলান ও ঝাঁপান গান: ভাগীরথীর পূর্ব তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া অঞ্চলে বোলান ও ঝাঁপান গানের প্রচলন দেখা যায়। বোলান হল হাল্কা রসাত্মক টপ্পা রীতির গান। এই গানের বিষয়বস্তু - শিবপূজা বা গাজনের পাঁচালী প্রভাবিত। ঢোলক, বাঁশি ও বেহালা সহযোগে তিন জন পুরুষ, নারী সেজে এই গান নানা রকম পালার আকারে পরিবেশন করে থাকেন। ঝাঁপান হল শ্রাবণ সংক্রান্তিতে গীত মনসা মঙ্গলের গান।

লোকসঙ্গীতের এই ধারা গুলি ছাড়াও মালসী, ডপ, গুনাইবিবি, গাজী ইত্যাদি বহু প্রকার লোকসঙ্গীত আমাদের বাংলাকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া বাংলার বাইরে কাজলী, চৈতী, ভাঙড়া, বীহু ইত্যাদি লোকসঙ্গীত বাংলা তথা ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির দর্পণ।

কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা এবং লৌকিক সংস্কৃতির চর্চা মানুষের দেহ ও মনে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে লোকসংগীতে তার চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলার তথা ভারতের পল্লীগীতি বা লোকসঙ্গীত গুলি সরল পল্লীজীবনেরই রসভাষ্য । আজও গ্রামে গ্রামে প্রতিদিন সকালে মেয়েরা জাঁতায় শস্য পিষতে পিষতে গান গায়, চাষীরা মাঠে চাষ করতে করতে গান করে, রাখলেরা গরু চরাতে চরাতে গান করছে এবং মাঝিরা নৌকা বাইতে বাইতে ঢেউ এর তালে তাল রেখে গান গাইছে। মেয়েরা আবার বিয়ের সময় বা সন্তান প্রসবের সময়ও গান গায়। বিয়ের সময় বর ও কনে উভয়ের বাড়িতেই গান গাওয়া হয়। বরের বাড়ীতে খুশি ও আনন্দের সুরে ভরা গান হয়, অপরদিকে কনের বাড়িতে করুন সুরের গান হয়। বিশেষ করে কনে যখন বাপের বাড়ী ছেড়ে স্বামীর ঘর করতে যায় সেই সময়ের গান গুলি খুবই করুন প্রকৃতির হয়। এই ধরনের গানের মধ্যে উত্তর প্রদেশের 'বাবুল' গান বিশেষ ভাবে প্রচলিত। উত্তর বিহারে এই গানের নাম 'সামজাঁও', রাজস্থানে এর নাম 'ওলন'।

বিভিন্ন ঋতু উৎসব পালনের সময়ও ঋতু-সঙ্গীত গাওয়া হয়। এই ঋতু-সঙ্গীত গুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল- হোলির গান বা ফাগের গান। হোলি হচ্ছে ফসল ওঠার উৎসব এবং এ উৎসবে শুধু পল্লীবাসীরা নয় শহরবাসীরাও আনন্দে মেতে ওঠে। হোলির সময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ গোপীদের নিয়ে লীলা করেছিলেন, সেই কৃষ্ণলীলা স্মরণেই এই হোলি উৎসবের গানগুলি গীত হয়। হোলি ছাড়াও চৈতী, কাজরী, বারমাস্যা প্রভৃতি আরো বহু ঋতু-সঙ্গীত সারা দেশ ব্যাপী গীত হয়। চৈত্র মাসে বারাণসী জেলায় গীত হয় চৈতী গান। কাজরী গান গীত হয় বিহার এবং উত্তর প্রদেশের উত্তর অঞ্চলে। এছাড়া মীর্জাপুরের কাজরী গানও খুব জনপ্রিয়।

শ্রাবণ মাসের ঘন কালো মেঘে আকাশের সব দিক দিগন্ত ছেয়ে যখন মুষলধারে বৃষ্টি নামে আর তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তর্গূঢ় অনুভূতি গুলি ধীরে ধীরে জেগে ওঠে আর ঠিক তখনি এই গানগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে তাদের মুখ থেকে। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে অনেকে উপবাস করে । এই সব উপবাস কালেও এক বিশেষ ধরনের গান গাওয়া হয়। বিশেষ বিশেষ জীবিকারও আবার বিশেষ বিশেষ গান আছে। এইভাবে লোকসঙ্গীতের প্রকাশ বহুমুখী। এই বাংলা তথা বিশাল ভারতবর্ষে যে বহু বৈচিত্র্য রয়েছে তা নানা ভাবে উৎসারিত।

লোকগীতি শুধু গীতি নয়, এর মধ্যে আছে গ্রাম্য জীবনের চিত্রকল্প। সে চিত্রকল্প স্পষ্ট উজ্জ্বল, তাতে আছে ভৌগোলিক বিবরণ, আছে তত্ত্ব, তথ্য, ইতিহাস, মানুষের জীবন ধারণ পদ্ধতি, আশা-আকাঙ্খা, প্রেম প্রয়োজনের কথা। সাধারণ মানুষদের জীবনের চিত্রানুগ বিবরণ এ গাথায় স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান। এ গাথাগুলি ভাব ও রসের দিক থেকে সমৃদ্ধ। এ যেন কেবল গান নয়, সেকালের জীবন্ত চিত্র, যে চিত্রে গ্রাম্য জীবনের সকল দিক আমাদের দৃষ্টিতে জীবন্ত বলে মনে হয়। অফুরন্ত প্রানরস ও অক্ষয় প্রেমের কথা রয়েছে এর অনেক বয়ানে। কিন্তু বর্তমানে সময়, পরিবেশ ও রুচি পরিবর্তনের ফলে এই শ্রেণীর গায়ক এখন ক্ষীয়মান। এছাড়া স্বাধীনতার পর আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক অগ্রগতি শুরু হওয়ায় এইসব অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বদলাচ্ছে। প্রাচীন বিশ্বাস ও প্রথার জোর এখন কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পোষাক-পরিচ্ছদ ও আমোদ-প্রমোদের নতুন নতুন রীতি যুব মনকে আচ্ছন্ন করেছে। চিরাচরিত প্রথায় ও বয়স্কদের বিশ্বাস নিয়ে যে প্রাচীন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ছিল, তাও ভেঙ্গে পড়েছে। উৎসব গুলির রূপ ভিন্ন ধরনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোক-গাথার ভাব পূর্বে যত সমৃদ্ধ ছিল, এখন আর তত নেই। তবুও বর্তমান কালের ঘটনাবলী আজও গ্রাম্য কবিদের উৎসাহিত করে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১) গোস্বামী. প্রভাতকুমার, ভারতীয় সঙ্গীতের কথা, আদি নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৬

২) প্রজ্ঞানানন্দ. স্বামী, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, ১৯৯১

৩) দত্ত. দেবব্রত, সঙ্গীত তত্ত্ব, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১
৪) বন্দ্যোপাধ্যায়. শ্রী নীলরতন, সঙ্গীত পরিচিতি, আদি নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০৭
৫) নস্কর. ডঃ স্বপন, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিকথা, আদি নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০৯
৬) তেওয়ারী. ডঃ শান্তনু, স্কুল কলেজের গান, আদি নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১১